সঞ্জীবনী সুধা

অর্থাৎ

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

—*—

১ রামেশ্বরের অদৃষ্ট।
২ দামিনী।
৩ পালামৌ।

—*—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—জীবনী

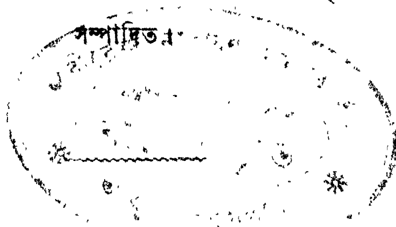
ও

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—সমালোচনা

সম্বলিত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

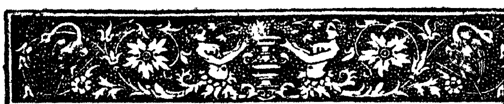
সম্পাদিত।



HARE PRESS:—CALCUTTA.

1893.

মূল্য ৸৹ বার আনা।



৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

জীবনী।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবি
আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থা
অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ
উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী; তাহাদের ভাগে
না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ
করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে ও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতি
এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন
প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যে ও ঘটে না; কেননা অন্ধকার
দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারি চাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্র

---

* ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবন চন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীব চ[ন্দ্র] নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের ন[াম] দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

নাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ গুণ উভয়ই কীর্ত্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষগুণ দুই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষগুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেননা কিছু কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। তাহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশ-মুখো। তাহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্ম ভূমি।* তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, যে তাহার জন্মকালে, তিনটী গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কিনা।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরুমহাশয় শিক্ষা মন্দিরের দ্বার রক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীব চন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপানি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন: গুরু মহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেননা তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্র ও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

---

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীব চন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধা হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই “দাদা মহাশয়”, কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীব চন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটী কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে, কাঁটাল পাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার এক জন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেননা আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীব চন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীব চন্দ্রকে আবার হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়,

কালি মাষ্টার,* আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষা-বিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্ত্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে দুই দিকেই বিষম শঙ্কট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিগে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদে ও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতক গুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চ্চার হানি

হইতে লাগিল। নিম্ন লিখিত ঘটনাটীতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলীকালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড মাষ্টর গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এতুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়া শুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম, সে তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটী তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এবিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না লেখা পড়া করার ভান্ করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর

শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন, যে তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বৰ্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই ; বৰ্দ্ধমান দূরদেশ। এই সম্বাদ যথা কালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, যে ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারিদিক আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটা উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন, যে সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই, যে পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল ; শয্যাহইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভা বলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বৰ্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটী সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানি গিরিটী সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানি গিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটী ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানিগিরিটী পরিত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া শুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এসকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য

না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইন্‌কমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতে ছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটী আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না, যে এ জিনিষটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজ দিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তক খানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব

সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তক খানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তক খানি প্রচারিত হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন, যে ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ্ ফুল বেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ শালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills *vs.* Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্যছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব, সঞ্জীবচন্দ্রকে একটী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃদ্‌সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর

পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টী মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথ নাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এ গুলি যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না।

সমূলক হইলেও, গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানী যদি কোন কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটী চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্‌সস্ হইল। এ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপরে অর্পিত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল ঠিক ঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরানী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীব চন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীব চন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এই খানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্য কাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও

বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ শালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটী ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নামদিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শনে ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে আর এক খানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্র খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটী উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ শালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার সত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ শাল হইতে ১২৮৯ শাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতায় সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত; এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ", "আনন্দমঠ", "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জাল প্রতাপচাঁদ", "পালামৌ", "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, একবৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই মাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রর।

ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে, সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটী সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম —সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল, যে, তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি "মুগুরিবাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে

লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী মধ্যে (১) মাধবী লতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

পালামৌ, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না কেবল সেইখানে এক এক বার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীব বাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য,একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা ঘাস দেখিবার জন্য প্রায়ই দাঁড়ান। কখনও বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এদিক ওদিক করিয়া, এটী সেটী দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাহার কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে তাঁহাকে এইরূপে চলা ফেরা করিতে দেখিতে পাই। এ প্রণালীর দোষ গুণ দুই আছে। কিন্তু দোষে গুণে এই যে একটী প্রণালী, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা একা সঞ্জীব বাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়। সঞ্জীব বাবুর যথেষ্ট নিজত্ব (originality) আছে।

এ প্রণালীর দোষ কিছু আছে। যে বেশী থামিয়া থামিয়া

এটী সেটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যায়, সকলে তাহার সঙ্গে যাইতে ভাল লাগে না, অনেকে তাহার সঙ্গে অধিক দূর যাইতে পারেও না। কিন্তু কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, পালামৌতে ইহা নাই বলিলেই হয়। পালামৌও এই প্রণালীতে লিখিত; কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌর ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোন কথাই কল্পিত নয়। কিন্তু মিষ্টতা ও মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।

এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দেখা বা সেইরূপে দেখা। সচরাচর লোকে যাহা দেখে না বা যেরূপে দেখে না, সঞ্জীব তাহাই দেখিতে এবং সেইরূপেই দেখিতে ভাল বাসিতেন, এবং তাহা সেইরূপে দেখিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে লাতেহার পাহাড়ের "ক্রোড়ে" গিয়া বসিবার জন্য সঞ্জীব বাবু বড় ব্যস্ত হইতেন। সে ব্যস্ততা কেমন? না, এইরূপ—

"যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে"—

ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্য ঘটনা বোধ হয় অনেকে এমন করিয়া দেখে না—"জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়"—আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে? সঞ্জীব বাবু এইরূপ বিষয় সকল

এমনি করিয়া লক্ষ্য করিতে ভাল বাসিতেন, লক্ষ্য করিতে পারিতেন, লক্ষ্য করিতে জানিতেন। এইরূপ দর্শনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ ছিল। পালামৌতে যে নববিবাহিতা মেয়েটীর কথা আছে—যাহার কথা, অতি সামান্য হইলেও, পড়িতে পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধ হয় সঞ্জীব বাবু না লিখিলে সে মেয়েটীকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীব বাবু লিখিয়া গিয়াছেন। এমন করিয়া দেখায় যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সূচিত হয়, সঞ্জীব বাবুতে তাহা যত দেখি অন্য কোন বাঙ্গালা লেখকে তত দেখি না। এইরূপে দেখা সঞ্জীব বাবুর ধাত্ এবং এই ধাত্ সঞ্জীব বাবুর নিজস্ব।

আর এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীব বাবুর ধাত্, সঞ্জীব বাবুর ভাষাও তেমনি সঞ্জীব বাবুর ধাত্। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট, কারুকার্য্যহীন। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব খুব একটা বড় কথা, কিন্তু পালামৌতে তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেমন সরল ভাষায় সরলভাবে বুঝাইয়াছেন দেখুন :—

"আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা এ

সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গ কবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণন করিতে পারেন ; দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমি তাহা পারি না। * * আমি যে প্রকারে রূপ দেখি নির্লজ্জ হইয়াও তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারো দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপ রাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

"বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভূতপ্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতেও সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগেও সেইরূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, দেহ দেখিয়া ভুলি না, ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক্ অথবা যুবতীতে থাক্ আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে।"

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা। এমন উচ্চ কথা এত সহজ সরল ও পরিষ্কার ভাষায় অতি অল্প লোকেই কহিতে পারে। কিন্তু ছোট বড় সকল কথাই এইরূপে কওয়া সঞ্জীব বাবুর

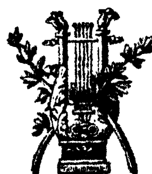
স্বভাব। এই চমৎকার স্বভাব সঞ্জীব বাবুর নিজত্ব। এই স্বভাবের গুণে তাঁহার সকল লেখাই আবেগ্যশূন্য, আয়াসশূন্য, ধীরগতি, শান্তভাবাপন্ন। তিনি তাঁহার অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী কথাও যেন "অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে" লিখিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের জ্ঞান শান্তস্বভাব বালকের ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে নিজত্বে তাঁহার সমান অতি অল্পই দেখিতে পাই।

সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না। কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এই জন্যই তিনি পালামৌর সেই বাইজীতে গেঙ্গোখালির মোহানার সেই পাখীটির রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোল-কামিনীদিগের দেহে "কোলাহল" দেখিয়াছিলেন, এবং এইজন্যই যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত তাহার আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে; এবং যখন সেই সমুদ্রে অস্পষ্টলক্ষ্য একটি তরঙ্গ উচু হইয়া নাচিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর মনে করিত, তাহার আনন্দদুলাল নাচিতেছে। সৌন্দর্য্যের এই সুবিস্তৃত সুপ্রসারিত জাতিভেদশূন্য সর্ব্বসমন্বয়-কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উদার। এই ভাব সঞ্জীব তাঁহার সেই অতুলনীয় মৃদু মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা যে প্রণালীতে লিখিত, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সে প্রণালীতে লিখিত নয়। শেষোক্ত দুইটীই অতি ক্ষুদ্র গল্প, অতএব কোনটীতেই কণ্ঠমালা বা মাধবীলতার

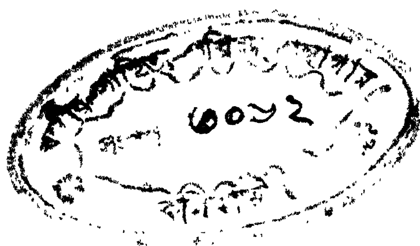
প্রণালী খাটিত না। এই দুইটী ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীব বাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্ত্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরে ও দামিনীর পাগ্‌লীতে এই থর উদ্দাম ভাব বেশ পরিস্ফুট। সঞ্জীব বাবু পাগল পাগ্‌লী গড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। মাধবীলতায় পিতম পাগলা আছে, কিন্তু পিতমের পাগলামী দেখিতে দেখিতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়। রামেশ্বরের অদৃষ্টে স্বয়ং রামেশ্বরকে একবার পাগলপ্রায় দেখি। সে পাগলামী ক্ষণকালের নিমিত্ত এবং দেখিতেও অতি উত্তম, কারণ উহা উৎকট দাম্পত্য প্রেমের বিকট প্রতিধ্বনি। দামিনীতেও এক পাগলী দেখিতে পাই। সে বড় বিষম পাগলী। পতিশোকে সে আপনি পাগলিনী। তাই যে পতিপ্রাণা পতির জন্য মরে তাহার পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়!

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।



রামেশ্বরের অদৃষ্ট।







রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামেশ্বর শর্ম্মার পঁচিশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন। রামেশ্বরের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সমুদয় রামেশ্বর শ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। পিতার স্বর্গার্থে যে যাহা পরামর্শ দিল, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। আত্মীয় কুটুম্বগণ স্ব স্ব গৃহে গেল। রামেশ্বর তখন জানিলেন যে তাঁহার আর কিছুই নাই। পরিবারের ভরণপোষণ করা কঠিন হইল। তাঁহার ঘরে, যুবতী ভার্য্যা পার্ব্বতী; এবং তিন বৎসরের পুত্র আনন্দ দুলাল। এক দিবস সকলেই উপবাসী রহিল। শিশু আহারের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল; সন্তানের ক্রন্দন

দেখিয়া পার্ব্বতীও কাঁদিতে লাগিলেন। রামেশ্বর কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, নিস্ফল হইয়া রিক্তহস্তে আসিয়া দেখিলেন উভয়ে তাঁহার প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া আছে। দ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে ব্রাহ্মণভোজনের শুষ্কপত্র, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতির স্তূপমধ্যে গ্রাম্য কুক্কুরেরা আহার অন্বেষণ করিতেছে, শিশু একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছে। রামেশ্বরকে দেখিয়া শিশু দৌড়িয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! আমাল জন্যে কি এনেস?" রামেশ্বরের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; দেখিয়া পার্ব্বতীর চক্ষু জলে পুরিল; শিশুর মুখপানে চাহিতে সে জল উছলিয়া পড়িল; তখনই আবার মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিতে, উভয়েই কাঁদিয়া উঠিলেন; বালক, উভয়ের মুখপ্রতি দুই একবার চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিল। তিন জনে একত্রে অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু নিদ্রা গেল। এই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; রামেশ্বর উঠিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিলেন। একস্থানে দেখিলেন, বালজ্যোৎস্নার আলোকে এক দীর্ঘিকাতীরে কতকগুলি অল্প বয়স্ক বাবু, তেড়িকাটা, কোট গায়ে, কৌমুদীদীপ্ত স্বচ্ছবারির উপর পয়সা নিক্ষেপ করিয়া "ছিনিমিনি" খেলাইতেছেন। রামেশ্বর তাঁহাদের নিকট গিয়া, যোড়হাত করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে চারিটি পয়সা যাচ্ঞা করিলেন। বাবুরা উচ্চ হাস্য করিলেন; একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, আমাদের পয়সা তোরে দিতে গেলাম কেন?" রামেশ্বর কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যাই, আপনারা পয়সা জলে ফেলিয়া দিতেছেন।" বাবুরা বলিলেন, "আমাদের পয়সা আমরা

জলে ফেলিব, তোর কিরে শ্যালা?” এই বলিয়া ঘুষা তুলিয়া, একজন রামেশ্বরকে মারিতে গেলেন। রামেশ্বর, শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া মনে ভাবিলেন, “এই বানর গুলাকে একএকটা চড় মারিয়া পয়সা কাড়িয়া লইতে পারিতাম—কেন লইলাম না?” ক্ষুধার জ্বালায় রামেশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ লুপ্ত হইতেছিল।

রামেশ্বর গ্রামান্তরে গেলেন। তথায় এক বাটীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গৃহমধ্যে সকলে নিদ্রিত বোধ হইল; আনন্দ-দুলালের সেই ক্ষুধাপীড়িত কাতর, শৈশবসুকুমার মুখ মনে পড়িল; পার্ব্বতীর রোদন মনে পড়িল; ক্রীড়াশীল বাবুদিগের নিৰ্দ্দয় ব্যবহার মনে পড়িল। ভাবিলেন, আমি একা ধর্ম্মপথে যাইব কেন? তখন রামেশ্বর, এক গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ করিয়া পেটরা হইতে পয়সা চুরি করিলেন। পেটরায় তিনটি টাকা আর আট আনা পয়সা ছিল; রামেশ্বর কেবল সেই আট আনা পয়সা লইয়া আসিলেন। গৃহস্থেরা তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

রামেশ্বর আসিতে আসিতে ভাবিলেন, পয়সা হইল, চাউল লবণ কোথায় পাই? অতএব তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর এক গ্রামে গেলেন। নিকটস্থ পাঁচ সাত গ্রামের মধ্যে কেবল সেই গ্রামে একখানি দোকান ছিল। রামেশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানিকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন; দোকানী স্থানান্তরে ছিল, অতএব কোন উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তিনি দোকানের দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাত্রোপযোগী চাউল লবণ দাল সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রাগ্রে তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন; তাহার উচিত মূল্য সেই স্থানে রাখিয়া

বহির্গত হইলেন। পথে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল কিন্তু কোন বিঘ্ন ঘটিল না; বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। পার্ব্বতী পাক করিল; রামেশ্বর ও শিশু খাইল; পার্ব্বতী খাইল না। অল্প সামগ্রী আসিয়াছে—পার্ব্বতী খাইলে পরদিনের জন্য কিছু থাকে না। পার্ব্বতী উপবাস করিয়া, গোপনে নিজাংশ স্বামী পুত্রের জন্য হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিল। রামেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন না।

পরদিবস রামেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া ভা তপুর গ্রামে সপরিবারে গেলেন। এই গ্রাম তাহার জন্মভূমি হইতে দুই দিবসের পথ দূর। এখানে তাঁহাকে কেহই জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, অতএব ভাবিলেন এখানে উগ্রক্ষত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনায়াসে ইতর লোকের ন্যায় শারীরিক শ্রমদ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন। পার্ব্বতীও বলিলেন, তিনি কোন ভদ্র সংসারে দাসীবৃত্তি করিবেন। এই পরামর্শ করিয়া তথায় ভদ্রাসন বিক্রয়লব্ধ অর্থে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন; কিন্তু অপরিচিত বলিয়া রামেশ্বরের অদৃষ্টে দাসত্বও ঘটিল না। যেখানেই যান সেই খানেই জামিনের প্রস্তাব হয়। অপরিচিতের জামিন কে হইবে? নিজগৃহবিক্রয়ে যে কয়েকটি টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই অবস্থায় রামেশ্বর একদিন গ্রামের নায়েবের নিকট আপন দৈন্য জানাইয়া একটি পিয়াদাগিরি কর্ম্মের প্রার্থনা করিলেন। নায়েব বলিলেন, "সে কর্ম্ম এক্ষণে খালি নাই, কিন্তু আপাততঃ উপার্জ্জনের এক উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমার অন্দরে গত কল্য আসিয়াছিলেন, আমি

তাঁহাকে সে কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে তাহা শুনিয়া বড় রাগিয়া উঠিল। তুমিও রাজি হইবে বোধ হয় না। সে সব কাজ তোমা হইতে হইবে না। অতএব আর তাহা তোমাকে বলা বৃথা।”

রামেশ্বর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “পেটের জ্বালায় আমার অসাধ্য কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মতামত সকল বিষয়েই অগ্রাহ্য; অতএব আমাকে বলুন, আমি তাহা বিবেচনা করিব।”

নায়েব বলিলেন “তুমি শুনিয়া থাকিবে প্রায় দুইমাস হইল, এই গ্রামে একটী স্ত্রীহত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কে হত্যা করিয়াছিল তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। দারগা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, আমিও বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। হত্যাকারীর স্থির না হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব রুষ্ট হইয়া আমাদিগের অমনোযোগ অনুভব করিয়া জমীদারের দণ্ড করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে আবার একটি চুরি হইয়া গিয়াছে; তাহারও এপর্য্যন্ত কোন উপায় হয় নাই। দারগা একটী লোককে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু সে পলাইয়াছে। তাহার উদ্দেশ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, শীঘ্র যে পাওয়া যাইবে এমতও সম্ভাবনা নাই। শীঘ্র একজন অপরাধী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আবার জমীদারের দণ্ড হইবে, অথবা হয় ত তাঁহার জমীদারী যাইবে, অতএব আসামি সাজাইয়া একজনকে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে আসামি সাজিবে তাহার বিশেষ ভয় নাই। সামান্য পানপাত্র চুরি হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত উর্দ্ধসীমা একমাস

কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে, অধিক নহে। কর্ম্মান্তরে বিদেশে গেলে কখন কখন একমাসেরও অধিক কাল পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাও সেইরূপ; অধিকন্তু বিদেশে গিয়া এক মাসে যে উপার্জ্জন সম্ভব তাহার দশ গুণ অধিক উপার্জ্জন হইবে। জমীদার বলিয়াছেন যে, যে আসামি হইয়া যাইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিবেন। অতএব এই এক লাভের পন্থা আছে। আবার তুমি জেল হইতে অব্যাহতি পাইলেই তোমাকে এই সরকারে উপযুক্ত কর্ম্ম দিব।"

নায়েবের এই প্রস্তাব শুনিয়া রামেশ্বর নিজকৃত পূর্ব্ব চুরি মনে করিয়া শিহরিলেন। ভাবিলেন, বুঝি বিধাতা নিশ্চিতই কারাগারই আমার কপালে লিখিয়াছেন, নহিলে সেদিন আমি পয়সা চুরি করিতাম না। সে পাপের ফল এক দিন আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে—তবে দুদিন অগ্র পশ্চাতে কি আসিয়া যায়? কেনই আপন ইচ্ছায় জেল খাটিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিব? আপন ইচ্ছায় এ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? যাহাই হউক উপস্থিত অন্নাভাব নিবারণের উপায় ইহা অপেক্ষা আর কি হইবে?

রামেশ্বর উঠিয়া বলিলেন, "আমি সম্মত, আমার পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দাও।" নায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। জেলায় যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই চুরি স্বীকার করিতে হইবে; একরার না করিলে আবার আমাকে মিথ্যা প্রমাণ যোজনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।"

রামেশ্বর উঠান হইতে মাথা নাড়িয়া নায়েবের কথার উত্তর

দিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বাটী পৌঁছিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। পার্ব্বতী টাকা হস্তে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কোথায় পেলে?" রামেশ্বর সবিস্তারে সকল বলিলেন।

পার্ব্বতী উহা শুনিবামাত্র টাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর পাদমূলে আসিয়া পদদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধমুখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "এমন কর্ম্ম কখন করিও না, ছার টাকার জন্য সাধ করিয়া কয়েদী হইও না, আমি ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব; তুমি এমন কর্ম্ম করিও না, এই বিদেশে আমায় রাখিয়া তুমি যাইও না, আমার নিমিত্ত না ভাব, ছেলের মুখপানে চাও, ছেলের আর কে আছে, ছেলের রোগ হলে আমি কোথা যাব, কাহার দ্বারে দাঁড়াইব?" এই বলিতে বলিতে পতিবক্ষে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিলেন। এই সময়ে শিশু দ্বারের নিকট কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতেছিল, মার ক্রন্দন শব্দ তাহার কর্ণে গেল, ব্যস্ত হইয়া কর্দ্দম আপনার অঙ্গে মুছিতে মুছিতে উভয়ের প্রতি চাহিতে লাগিল; শেষে "বাবা টুই মাকে মাল্লি?" এই বলিয়া মার অঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়া শত শত মুখচুম্বন করিল, আর বলিতে লাগিল, "মা টুমি কেডো না, বাবাকে খুব মালব অকুন।" অমনি পার্ব্বতী সকল ভুলিয়া গেলেন, পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন, "কৈ ওঁরে মার আগে।" শিশু কোল হইতে উঠিয়া "এই মেলেসি!" বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে বাপের পিঠে মারিল, আবার তখনই গলা ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। পার্ব্বতী শিখাইয়া দিতে লাগিল, "আবার মার।" শিশু তৎক্ষণাৎ "আবার মেলেসি" বলিয়া আবার

সেই কোমল অমৃত মাখা কর পিতার পৃষ্ঠে ফেলিল।' এইরূপ পবিত্র সুখে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে রামেশ্বর উঠিয়া টাকা গুলিন একত্রিত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন ; পার্ব্বতী সন্তান লইয়া অন্যমনে রহিলেন।

রামেশ্বর নায়েবের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমায় চালান দিতে আর বড় বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব হইলে বুঝি আমার যাওয়ার ব্যাঘাত হইবে। স্ত্রীর কাতরতা আর একবার দেখিতে গেলে আমার বোধাবোধ থাকিবে না, অতএব যাহা হয় করুন, আমি এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি।" নায়েব ব্যস্ত হইয়া দারগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। দণ্ডেক কালের মধ্যেই পদাতিকগণ রামেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া জেলায় লইয়া চলিল। তিনি আর স্ত্রী পুত্রকে দেখিয়া আসিলেন না।

তখন প্রথম রামেশ্বরের স্মরণ হইল এ যে জেলে যাইতেছি! জেল! যেখানে ব্রহ্মঘ্ন, নারীঘ্ন, পাপাত্মারা থাকে—যেখানে ডাকাত, রাহাজান, ঠগ, পরস্পরে বন্ধু—সেই জেলে! যেখানে মানুষকে গরু করিয়া ঘানিগাছে যোড়ে, সেই জেলে! যেখানে জাতি নাই, ব্রাহ্মণ মুসলমান এক পংক্তিতে খায়, হাড়ী ডোমের সঙ্গে এক শয্যায় শুইতে হয়, সেই জেলে! যেখাঁনে বিচার নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল বেত্রাঘাত আছে, সেই জেলে! কি অপরাধে? অপরাধ, খাইতে পাই না—অপরাধ স্ত্রী পুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু দেখিতে পারি না—এই অপরাধ।

এমন সময়ে শূন্যমার্গ বিদীর্ণ করিয়া, পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ লতা শাখা পত্র গ্রাম্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া, তীব্র করুণ মর্ম্মভেদী রোদন ধ্বনি রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া

দেখিলেন, যে পার্ব্বতী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে; কাঁদিয়া বলিতেছে "একবার দাঁড়াও! তোমায় দেখি।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দৌড়িয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পদাতিকেরা আসিতে দিল না, ধাক্কা মারিয়া লইয়া চলিল। রামেশ্বর আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন কয়েকটি গ্রামবাসী আসিয়া পার্ব্বতীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পার্ব্বতী ধুলায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে আর কেশরাশি ধুলায় ধূসরিত হইতেছে। রামেশ্বর আর দেখিতে পাইলেন না; ক্রমে দূরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; বায়ুসঙ্গে পত্নীর ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন সাগর উছলিতেছে, জগৎ কাঁদিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিসের পদাতিকগণ রামেশ্বরকে লইয়া গেলে পর রাত্রে দারগা আর নায়েব উভয়ে আহারান্তে একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; এমত সময় এক জন দাসী সংবাদ দিল যে রামেশ্বরের স্ত্রী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। এক্ষণে যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারিবে এমন বোধ হইতেছে। সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া আপনিও শুইয়াছে, কিন্তু এখনও ধীরে ধীরে কাঁদিতেছে।

নায়েব বলিলেন, "তাহার নিকট অদ্য যাহার থাকিবার কথা ছিল সে স্ত্রীলোকটি এখনও যায় নাই?" দাসী উত্তর

করিল, "সে সেখানে আছে; আমিও এপর্য্যন্ত ছিলাম। এই মাত্র আসিতেছি।"

দাসী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে দারগা বলিলেন "যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় আসামি পলাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকিবে। একান্ত না পলাইতে পারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আর একরার করিবার সম্ভাবনা নাই।" নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এক্ষণে উপায়।" দারগা বলিলেন যে "আসামী একান্ত স্বীকার না করে তবে অন্য প্রমাণ দিতে হইবে। আসামীর ঘর হইতে চুরির মাল বাহির করিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বাহ্লে তাহা পুঁতিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। একটা জলপাত্র এই সময়ে আপনি স্বয়ং যাইয়া উহার স্ত্রীকে সম্মত করিয়া রাখিয়া আসুন।" নায়েব বলিলেন "অদ্য রাত্র হইয়াছে; কল্য প্রাতে তাহা করা যাইবে। দারগা বলিলেন, "তাহা কদাচ হইবে না, প্রাতে অন্য লোক দেখিলে সকল কথা রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে যাও।" নায়েব অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্টশৃঙ্খল, চারিদিক হইতে রামেশ্বরকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। গভীর রাত্রে রামেশ্বর পদাতিকদিগের নিকট হইতে পলাইলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে সঙ্গোপনে আসিয়া গৃহের নিকট এক বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া রামেশ্বর লুকাইয়া থাকিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চিনিলেন, যে সে ব্যক্তি নায়েব। অতএব ভাবিলেন এই সময় নায়েবের

নিকট গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া টাকা ফিরাইয়া দিই। স্ত্রীর সুখসাধন নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারই কষ্ট হইল তবে আর টাকায় প্রয়োজন কি? এই ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে নায়েব তাঁহার দ্বারে গিয়া দাড়াইল। তখনও পার্ব্বতী অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। প্রতিবাসিগণ বলল "ওগো একটু নিদ্রা যাও নতুবা পীড়া হইবে।" এই বলিবামাত্র পার্ব্বতী আরও অধিক কাঁদিয়া উঠিল। নায়েব দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া বলিলেন, "মা একবার দ্বার খুলিয়া দাও, আমি তোমার স্বামীর কোন সংবাদ আনিয়াছি।" যেখানে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রামেশ্বর দেখিতেছিলেন, সেখান হইতে এ সকল কাথাবার্ত্তা কিছুই শুনা যাইতেছিল না।—পার্ব্বতীর অনুচ্চ রোদনশব্দও শুনা যাইতেছিল না। পার্ব্বতী নায়েবের কথা শুনিবামাত্র দ্রুত বেগে দ্বার খুলিয়া দিলেন. ভাল মন্দ কিছুই ভাবিলেন না। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'অনেক কথা আছে। প্রথমে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, নতুবা কে শুনিতে পাইবে।" রামেশ্বর দূর হইতে দেখিলেন যে নায়েব দ্বারে আসিয়া দ্বার নাড়িতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কি দুই একটী কথা বলিল, তাহার নিশ্বাস খরতর বহিতে লাগিল। আবার দেখিলেন অবিলম্বে পার্ব্বতী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিলে আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। রামেশ্বর মনে করিলেন, তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। ভাবিলেন, এই নিমিত্ত নায়েব আমাকে কৌশল করিয়া দারগার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অতএব ইহার প্রতিফল দিব, এই

বলিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের কথা-বার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন। একবার ভাবিলেন, কি কথা হইতেছে শুনি; অমনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারে পদা-ঘাত করিলেন। গৃহাভ্যন্তর নিস্তব্ধ হইল। তখন মর্ম্মযন্ত্রণায় একপ্রকার রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, তুমি যাহার জন্য কাঁদিতেছিলে সেই আমি আসিয়াছি—তোমার উপপতি তোমার ঘরে আছে, এখন আমি চলিলাম।" পার্ব্বতী এই স্বর শুনিল, আহ্লাদে কথা বুঝিতে পারিল না, উন্মত্তা হইয়া বহির্গত হইল। বহির্গত হইয়া প্রেমপূরিত স্বরে ডাকিতে লাগিল। রামেশ্বর বিস্মিত হইলেন। আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী দ্বার খুলিয়া স্বামীকে না দেখিয়া ডাকিতে ডাকিতে উত্তর না পাইয়া, শেষে কাঁদিতে লাগিল।

রামেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ভাবিলেন অন্যকে আর কষ্ট দিব না, আপনি আর কষ্ট পাইব না, এই ঘৃণিত পৃথিবী ত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিলেন। অপরাহ্নে যে ক্রন্দনধ্বনি মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শব্দ পৈশাচিক বোধ হইতে লাগিল।

রামেশ্বর কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন পদাতিকগণ ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "আমাকে বন্ধন কর; আমি আসিয়াছি।" রামেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল, বন্ধন করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তিনি বলিলেন "পরিবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাই গিয়াছিলাম। এখন চল তোমাদের ভয় নাই। আমি নিজে আসিয়া ধরা দিয়াছি, তাহাই তোমাদের দারগা আমাকে চালান

দিতে পারিয়াছেন. নতুবা তাঁহার সাধ্য হইত না। সে দিবস খুন করিয়াছিলাম, আমি ধরা দিই নাই বলিয়াই কেহ সন্ধানও পায় নাই।

ইহা শুনিয়া জমাদ্দার অতি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "সে খুন কি তুমি করিয়াছিলে?" রামেশ্বর উত্তর করিলেন, "হাঁ! আমিই সে খুন করিয়াছি।" জমাদ্দার আবার জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আদালতে স্বীকার করিতে পারিবে?" রামেশ্বর বলিলেন "অবশ্য স্বীকার করিব; কাহারে ভয়?"

আর কেহ কোন কথা বলিল না, সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পর দিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হইয়া রামেশ্বর দাঁড়াইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি সেই খুনি মামলার একরারি আসামি?" রামেশ্বর "হাঁ" বলিয়া সেলাম করিলেন। তখন তাঁহার আন্তরিক যন্ত্রণা বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, 'কোনরূপে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল.' এই বিবেচনায় হত্যাকারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। জমাদ্দার আনুষঙ্গিক প্রমাণ যোগাড় করিয়া দিলেন। রামেশ্বর দাওরা সোপর্দ্দ হইলেন। দাওরার বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। কিছুদিন পরে নিজামত আদালত দণ্ড কমাইয়া দিলেন। তখন পিনল কোড ছিল না; বিশ বৎসরের নিমিত্ত রামেশ্বর দ্বীপান্তরে গেলেন।

এদিকে পার্ব্বতী. একবার স্বামীর কথার শব্দ শুনিয়া আর উত্তর না পাইয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার সন্ধানে বনে বনে

ছুটিতে লাগিল। কোথাও স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না; কত ডাকিল—কোন উত্তর পাইল না। কত কাঁদিল—কেহ তাহাকে শান্ত করিল না। শেষে পদ্মানদীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তখন হঠাৎ মনে পড়িল, যে, রামেশ্বর যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার কথায় কি একটি শব্দ ছিল—অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ঙ্কর, একটি কথা ছিল—পার্ব্বতী তখন আহ্লাদে তাহাতে কাণ দেয় নাই—তখন রামেশ্বরের কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই; এখন সেই কথাটি মনে পড়িল—এখন তাহার অর্থ বুঝিল—এখন বুঝিল, রামেশ্বর কেন পলাইয়াছেন। বুঝিল—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, বুঝিল—এ সংসারে আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তখন তাহার চক্ষে আকাশ, নক্ষত্র, জল সকলই আঁধার হইয়া আসিল। নদী জলের একটি শব্দ হইল; জলে তরঙ্গ উঠিল, ক্রমে মিলাইয়া গেল, শেষ সকল স্তব্ধ হইল। পার্ব্বতী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর নাই—পার্ব্বতী জলমগ্না হইয়াছে।

———০———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘোরনাদী সমুদ্রের অনন্ত বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর! এই বালুকাময় উপকূলারূঢ় নারিকেল বৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায়, কোদালী হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে বিশবৎসর! এই সাগর প্রান্তব্যাপী ফেণবিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দ দুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বৎসর! স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, 'মরিব'—মরিতে পারিল না—বিশ বৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি, 'এই করিব,' আর এক জন মনে করেন আর। আমাদিগের কার্য্য, দৃষ্ট; তাঁহার কার্য্য, অদৃষ্ট!

যখন, বিশ্বাসঘাতিনীর কথা মনে করিয়া, রামেশ্বর মরিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ত আনন্দদুলালকে মনে পড়ে নাই। এখন দিবা রাত্রি, এই নির্ব্বাসিতের বাসদ্বীপে আনন্দদুলালের অকৃত্রিম, সরল হাসিভরা মুখ, তাহার আধ কথা, তাহার খেলা, মনে পড়িতে লাগিল। যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া, মৃদু মৃদু ডাকে, রামেশ্বর ভাবেন, আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্টলক্ষ্য একটি তরঙ্গ উচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন যে, আনন্দদুলাল নাচিতেছে। রামেশ্বর মনে করিয়াছিলেন যে তিনি বিশ বৎসর বাঁচিবেন না—কিন্তু বিশবৎসর বাঁচিলেন। কাল পূর্ণ হইলে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ভাতিপুরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই—তাঁহার সে পত্নী নাই, কই আনন্দদুলাল ত নাই! কেহ তাহাদের কথা কিছুই

বলিতে পারিল না। রামেশ্বর! রামেশ্বর কে? রামেশ্বরকে কেহ চেনে না।

কয়েকদিন রামেশ্বর সন্তানের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমিলেন। একদা তিনি হাটে যাইবার পথে বসিয়া থাকিলেন; ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার সন্তান অদ্য হাট করিতে আসিবে; রামেশ্বর যুবা পথিক মাত্রই সকলকে অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া রামেশ্বর শিহরিলেন; স্ত্রীলোককে দেখিয়া বোধ হইল সে বেশ্যা; আকার দেখিয়া, রামেশ্বরের বোধ হইল, সে পার্ব্বতী! রামেশ্বর যখন দ্বীপান্তরে যান, তখন পার্ব্বতীর বয়স বিশবৎসর এক্ষণে তাহার বয়স চল্লিশ হওয়ার কথা; ইহার সেই বয়স। যাহাকে বিশ বৎসর বয়সের পর আর দেখি নাই, তাহাকে চল্লিশ বৎসর বয়সে সহজে চেনা যায় না। যে পার্ব্বতীকে রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এ সে পার্ব্বতী নহে বটে, কিন্তু রামেশ্বর মনে বুঝিলেন যে, যে বৈসদৃশ্য দেখা যাইতেছে তাহা বয়োপরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে। বেশ্যা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়া শুষ্ক বনফুলের মালা গলায় দিয়া তামাক খাইতে খাইতে একজন মুসলমানের সহিত কথা কহিতেছে; দেখিবামাত্র রামেশ্বর তাহার নিকট গিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র কোথায়?" বেশ্যা আকাশমুখী হইয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "কে তোর ছেলে?" রামেশ্বর বলিলেন, "আনন্দদুলাল।" নটী বলিল "মরণ আর কি! তোমার দড়ি কলসী যোটে না?" রামেশ্বর বলিলেন "শীঘ্র যুটিবে; এক্ষণে বল্ আনন্দদুলালকে কোথায় পাঠাইয়াছিস্?" বেশ্যা উত্তর করিল,

,,চুলায় পাঠাইয়াছি—নদীর ঘাটে তারে পুতিয়া আসিয়াছি—তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল—সে গিয়াছে, এক্ষণে তুমিও যাও।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; জোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

গেলেন কোথায়? কোথায় যাইতেছিলেন তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। দ্বীপান্তরে বসিয়া এই পুত্রের মুখ ভাবিতেন। কবে আবার তারে দেখিবেন, বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেন। এই আশা এ পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থি ছিল। এক্ষণে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইল। এক্ষণে আর কোথায় যাইবেন? অথচ গেলেন।

পথে দেখিলেন, আর একজন স্ত্রীলোক একটি ছেলে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামেশ্বর হঠাৎ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া তাহার ক্রোড় হইতে ছেলে কাড়িয়া লইয়া নামাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিলেন, "তোরা রাক্ষসীর জাত! ছেলে মারিয়া ফেলিবি—ছেলে ছেড়ে দে।"

রামেশ্বর সমস্ত দিন পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইলেন রাত্রে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সম্মুখে এক দোকান দেখিলেন; দোকানি ঝাঁপ ফেলিয়া শুইয়া আছে। রামেশ্বর দোকানের ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া, প্রবেশ পূর্ব্বক সম্মুখে যাহা পাইলেন, খাইতে আরম্ভ করিলেন। দোকানি উঠিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর দোকানির গলদেশে হস্ত দিয়া দোকানের বাহির করিয়া দিলেন।

দোকানি ফাঁড়ি হইতে বরকন্দাজ ডাকিয়া আনিল;

রামেশ্বর বরকন্দাজের লাঠি কাড়িয়া তাহার মাথায় মারিলেন ; বরকন্দাজের মাথা ফাটিয়া গেল।

শীঘ্র রটিল, এক জন প্রসিদ্ধ দায়মালী, পিনোপিনাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দেশ লুঠ করিতেছে, যাকে পাইতেছে, তাকে মারিতেছে। পুলিষ শশব্যস্ত হইল ; মাজিষ্ট্রেট, রামেশ্বরের গ্রেপ্তারির জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। রামেশ্বর দিনকত লুঠিয়া খাইয়া মানুষ ঠেঙ্গাইয়া, লুকাইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সকলে বন্য পশুর ন্যায় তাঁহাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যত বদমাস, ডাকাইত, তাঁহার প্রতাপ শুনিয়া তাঁহার চারিপাশে জমিল। তখন রামেশ্বর ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া, মনুষ্য জাতির উপর ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না ; কিন্তু একবার প্রায় ধরা পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বদলে, বহু দূরে, এক ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। গৃহরক্ষকেরা সতর্ক এবং বলবান ; রামেশ্বর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন ; তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে বহিয়া আনিয়া গ্রামান্তরে এক জঙ্গলে ফেলিয়া গেল।

সেই গ্রামের লোক পর দিন প্রাতে সভয়ে দেখিল, যে এক জন মৃতপ্রায়, আহত ব্যক্তি বনে পড়িয়া আছে। তাহারা পুলিসে সংবাদ দিতে যাইতেছিল। এমত সময়ে সেই দিন এক জন ডাক্তার কোন ধনিব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ নগর হইতে সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এ মুমূর্ষু। আমি আগে ইহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাই ; এক্ষণে ইহাকে পুলিষে লইয়া গেলে, ইহার মৃত্যু হইবে। তোমরা পশ্চাৎ পুলিষে

সংবাদ দিও।" লোকে ডাক্তারের কথা শুনিল, পুলিষে তখন সংবাদ দিল না। ডাক্তার, তৎক্ষণেই চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনদান করিলেন। রামেশ্বরের উত্থান শক্তি হইবা-মাত্র, তিনি ডাক্তারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া পুলিষের হাত এড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামু সর্দ্দারের ভয়ে দেশ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু আনন্দ-দুলালীর শোক রামু ভুলিল না। শেষোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে একদিন রামু বা রামেশ্বর দলবল সঙ্গে এক ডাকাই-তিতে যাইতেছিল। রাত্র প্রায় দুই প্রহর। প্রান্তরে, বৃক্ষাগ্রে নদীজলে, চন্দ্র কিরণ কাঁপিতেছে। একখানি পাল্কি ধীরে ধীরে নদীর ধার দিয়া যাইতেছে। পাল্কির মধ্যে বাবু শয়ন করিয়া আছেন। পাল্কিতে শয়ন করিয়া বাবু অন্য মনে নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী, কন্যা, ইটের পাঁজা, নূতন বাগান নূতন বাগানের কেবলা মালীর দোরঙ্গা দাড়ী, তাহার মালিনীর খাঁদা নাক, বাবুর চিন্তার ভাগী হইল। বাবু এইরূপ ভাবিতে-ছিলেন, এমত সময় হঠাৎ পাল্কি দুলিয়া উঠিল—দুই এক পদ হটিল, শেষ ভূমিতে নামিল। বাবু পাল্কি হইতে মুখ বাহির করিলেন। শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি তরবারিফলকে চন্দ্রকিরণ জ্বলিতেছে, এবং যাহাদের হস্তে সেই তরবারি ছিল তাহারা গম্ভীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। বাবু

তখন সকল বুঝিলেন। দস্যুরা পাল্কির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক চুল ধরিয়া বাবুকে বাহির করিল। আর একজন আকর্ণ হস্ত তুলিয়া সড়কি সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতেছিল, এমত সময় রামেশ্বর সেই সড়কির ফলক ধরিয়া বাবুর প্রাণ রক্ষা করিল। এবং সকলকে বলিল, 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখি, এই ব্যক্তিকে বুঝি কোথায় দেখিয়াছি।" যে সড়কি নিক্ষেপ করিতেছিল সে ক্রুদ্ধ ভাবে উত্তর করিল, "তুমি সকলকেই দেখিয়াছ! সকলেই তোমার আত্মীয় কুটুম্ব, তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমরা বাবুর পরিচয় লই।" রামেশ্বর তখন দর্পে তরবারি ঘুরাইয়া বলিলেন, "যা সকল তফাৎ যা, নহিলে কে পারিস্, হাতিয়ার লইয়া এগো।" এই কথা শুনিয়া সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু আপনি কি ডাক্তার?" বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ডাক্তার। আমায় বাঁচাও, আমি চিরকাল তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।"

রামেশ্বর বলিল, "কোন ভয় নাই, আমিই আপনার ক্রীত দাস।" এই বলিয়া অন্য দস্যুদিগকে ডাকিয়া কি বলিল; তাহার অমত দেখিয়া শেষ যে উদ্দেশে তাহারা যেখানে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। তখন ডাক্তার বাবু দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে তুমি আমাকে চিনিলে, আর কেনই বা আমাকে রক্ষা করিলে, ইহা সবিশেষ জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

দস্যু বলিল, 'কয়েক বৎসর হইল আমি যখন হইয়া এক জঙ্গলে পড়িয়াছিলাম—আপনি আমাকে তুলিয়া লইয়া

গিয়া, প্রাণদান করিয়াছিলেন। গ্রাম্য লোকের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুলিষে দেন নাই। আমি আপনার নিকট চিরকাল বিকাইয়া আছি। চলুন, আমি আপনাকে ঘাঁটি পার করিয়া রাখিয়া আসি।”

ডাক্তার বাবু দস্যুর এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিলেন, “তুমি স্বভাবতঃ মহাত্মা—কেন এ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?”

রামেশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দেখিয়া, ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, এ ব্যক্তি গুরুতর মনোদুঃখ পাইয়া দস্যু হইয়াছে—চেষ্টা করিলে ইহাকে কুপথ পরিত্যাগ করান যায়। মনে ভাবিলেন, এ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—ইহার উদ্ধারের উপায় করা আমার কর্ত্তব্য। যখন ডাক্তার বাবু রামেশ্বরকে বলিলেন. “তুমি কে? কেন তোমার এ দস্যুবৃত্তি ঘটিয়াছে? তোমার বৃত্তান্ত জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত কর। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।” দস্যু বলিল, “আপনিও একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আপনার দ্বারা যদি এক্ষণে সেই জীবনের কোন বিঘ্ন হয়, তাহাতেও আমার আক্ষেপ নাই। এই বলিয়া আপনার পূর্ব্বপরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। শেষ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, “যদি আমার সন্তান জীবিত থাকিত! যদি তাহাকে আর দেখিতে পাইতাম!” এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল। ডাক্তারও তাহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে চক্ষের জল মুছিয়া ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন।

"আমি সেই ভাতিগ্রাম চিনি। সেখানে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। আপনার পূর্ববৃত্তান্ত সবিশেষ আমি সেখানকার নায়েব ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। আপনার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! সেইজন্য আপনি ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছিলেন।

রামেশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি?" ডাক্তার কলিলেন, "আপনি হাটের পথে যে বেশ্যাকে পার্ব্বতী মনে করিয়াছিলেন, সে পার্ব্বতী নহে।

রামেশ্বর বলিল, "না হউক—সমান কথা। সে পাপিষ্ঠাও কোথায় বেশ্যাবেশে কালকাটাইতেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, আজ্ঞে না। তিনি আপনার শোকে পদ্মার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

রামেশ্বর এ কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যে প্রকারে হউক, ডাক্তার বাবু প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। নায়েব ও দারগার পরামর্শ হইতে পার্ব্বতীর পদ্মায় নিমজ্জন পর্য্যন্ত, প্রকৃত কথা রামেশ্বরের নিকট সবিস্তারে বলিলেন। শুনিয়া, রামেশ্বর আপন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমাকে প্রতারণা করিও না—শপথ করিয়া বল, একথা কি সত্য? মিথ্যা বল, তবে ব্রহ্মহত্যায় পাপী হইবে,—এসকল কথা কি সত্য?

ডাক্তার বলিল, "এ সকল কথাই সত্য।"

তখন রামেশ্বর ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল কোমল

পুষ্পশোভিত তীরভূমিতে উপবেশন করিলেন। দুই করে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। ক্রমে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরে রামেশ্বর, ভূমিতে লুঠাইয়া "পার্ব্বতি পার্ব্বতি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়াই ডাক্তার বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, হাত ধরিয়া উঠাইলেন; বলিলেন।

"আপনি কাঁদিবেন না। এই দুঃখের সময়ে আপনাকে আমি একটি সুসংবাদ দিব। আপনার পুত্র মরে নাই।"

রামেশ্বর বিদ্যুদ্বৎ বেগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দুলাল জীবিত আছে? শীঘ্র বল সে আমার কোথায়!" 'আপনার পুত্র আপনার পাদমূলে।' এই বলিয়া ডাক্তার বাবু রামেশ্বরের পদতলে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমে বুঝিল। দুই হস্তে সন্তানের মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল; চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না; তখন সন্তানের মস্তক বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "সত্যই বটে এই আমার আনন্দদুলাল।" ক্ষণেক বিলম্বে পিতার বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া সন্তান বলিলেন, "আপনি এই পাল্কিতে চড়িয়া আমার গৃহে চলুন, কি প্রকারে আমি প্রতিপালিত হইলাম, এবং লেখা পড়া শিখিলাম তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিব।"

রামেশ্বর বুঝিলেন, তিনি এক্ষণে পুত্রের সঙ্গে গেলে পুত্রকে পদব্রজে যাইতে হইবে। অতএব বলিলেন।

"তুমি আগে চল। আমাকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া যাও, আমি কাল প্রাতে পৌঁছিব।" আনন্দ-

দুলাল বিশেষ অনুরোধ করাতেও রামেশ্বর শুনিলেন না, সুতরাং পুত্র অগ্রসর হইলেন। রামেশ্বর সেই নদীতটে বসিয়া সাধ্বী পার্ব্বতীর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে রামেশ্বর পুত্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া, পুত্রকে পুনরপি আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে অব্ধাব-গুণ্ঠনাবৃতা এক স্ত্রীলোক আসিয়া রামেশ্বরের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই রামেশ্বর চমকিল—এ কার গলা! দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল, ভূপতিতা—পার্ব্বতী!

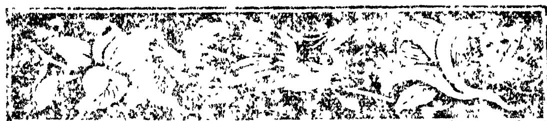
তখন রামেশ্বর পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সে কি! তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার মাতা পদ্মায় ডুবিয়াছিলেন।"

আনন্দদুলাল বলিলেন, 'আমি সত্যই বলিয়াছি। মা, পদ্মায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন কিন্তু মরেন নাই—জালিয়ারা তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পশ্চাৎ শুনিবেন।'

তখন তিনজনে, একত্রে আহ্লাদে রোদন করিতে করিতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতে লাগিলেন।

দামিনী ।





দামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুকাল হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে স্রোত-তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল "আয়ি। আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধা মাতামহীব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না; অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল

না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে, এক্ষণে আর উপায় নাই; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীর ভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। শয়ন মাত্রেই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভারি হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময় পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীর ভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখনও পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিত দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রা ভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতে দ্বাদশ বর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষিশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর হইয়াছে কি? দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল আমার উপর রাগ করিয়াছ? দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কতক গুলিন পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিয়া দামিনী তাহাকে রমেশ দাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত। পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত "রমেশ দাদা দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশ-

দাদা তাহার "আপনার জন।" আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশ দাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকট যাইয়া দাঁড়াইত। হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবে গম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতরা! দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ার সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভাল বাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত।—একটু একটু—কেবল ছায়াটি—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত!

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে আর এক দিবস অপরাহ্ণে একটি ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্য কিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জন সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতে-ছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটি স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহারে দামিনী রমেশ দাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার

সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহে তাহার জন্য চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী ; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটি পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া দামিনীকে বলিলেন "কোন চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে ?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুরি করতে পারে না ? খুব করেছে চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি ? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন ; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পুরিয়া আসিল ; দামিনী কান্দিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে ?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন ?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর এক জন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে

আজি মার দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন স্বপ্নের কণ্টা অর্দ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীর যেন কি মনে পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া, তাহার বক্ষে মাথা দিয়া 'মা! মা!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু,তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। —কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হাঁগা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী, কিছু বলিল না, "মা মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দামিনী বলিলেন,

"কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন," বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল,

"দেখ তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটি কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত ?"

হাঁ সেই ত মা। দামিনীর মা স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে ? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে, সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত ?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইয়াছিল সে দিকে আবার দেখিলেন ; পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন তাঁহার অনুসরণ করি ; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোকটি কে ?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন। দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে ভাগী-রথীতীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটি স্ত্রীহত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টা-লিকার নিকট দিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবে এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্য প্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালি-কায় বসিয়া আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিত. দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্র দুই প্রহরের সময় পাগল স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া

অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানা-ভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের অশ্বথ বৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল ক্রমে দুই একটি মসাল জ্বালিত হইল। এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতি করে এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া ভৈরবীবেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কি দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতের সঙ্গে পাল্কি থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগল তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পরম আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকারে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদুর গেলে একজন শিবিকা-বাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেরে তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস?" পাগল উত্তর করিল "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন?"

বাহক উত্তর করিল এবড় ভয়ানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না। পাগল একথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন

ইচ্ছানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল "কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ির কনে ?" বাহক কহিল "হিন্দুর কনে মুসলমানের বর।" পাগল উত্তর করিল "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে স্ত্রীলোকটি পাগল অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বর ?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন না শব্দ করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতে ছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে সে ভার নামাইবে কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, তুমি স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে অতএব তুমি পালাও। পাগলী বলিল, বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন ? বাহক উত্তর করিল এব্যাপার বিবাহের নহে ; যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপর যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন ; তাই বলিতেছিলাম কাটাকাটি হইবে।

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল কাহার কন্যা লইয়া যাইবে ? বাহক বলিল আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ ; যুবতীর স্বামী নাকি অদ্য

কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।

এ কথাই শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, আমি দরিদ্র বাহক পেটের জ্বালায় সকল করি; আমাকে মারিলে কি হইবে; আমি হিন্দু অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোল-যোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে, নতুবা আর উপায় নাই।

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, হিন্দুর হিন্দুত্ব যায় সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ হয় একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে একবার সকলে উঠ।

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?" কেহ বলিল "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপর দেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক

ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরে অগ্নি যে নিবায় কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এবোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনের দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলী দেখিল কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগলীর কপোল মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বতন উন্মত্তা হইয়া সিংহীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। শেষ ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্কির চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলী বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদার পুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদার পুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর দেখিতে পাইল না।

পদাতিকেরা দেখিল যে ফৌজদারপুত্র সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কিতে তুলিল। পাল্কি হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতা বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয় কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করি[illegible] আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন "কি বিপদ! কি বিপদ!" কেহ বলিলেন "কখন কাহার কি ঘটে কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন অদৃষ্টই মূল। অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "পূর্ব্বে ইহার কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন "রমেশের প্রয়োজন কি? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশজন আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদর বাড়ীতে থাকিতাম তবে যা হয় এক-খানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠি-লাম, ভাল করে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম, একটীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম; এসকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এসকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি পাছে যবনেরা পিছলে পলায় এই মনে করিয়া গাত্র-মার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না; গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম পুতির তক্তা আন। ব্রাহ্মণী বলিলেন তাহার কর্ম্ম নহে। শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটি ইট আনিয়াদিল, আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্ব্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন এমত

সময় এক জন কৃষক আসিয়া বলিল যে ফৌজদার পুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।

আর এক জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে এত ডাকা ডাকি করেছে তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড় না হাকিম বড়? এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরে আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? সকলে উত্তর করিল যে মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। দোষ তবে সকল আমার?

ক। না, তোমায় দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে?

গৃ। দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালি চূণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?

ক। কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক যায় নাই, যবনগৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃ। কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, একথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সম্বাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগি পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে আমি থাকিতে আর পলাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোক জন আনাইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন "তুমি যাহা বলিলে তাহা আমার বিশ্বাস হইল, আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী। এক্ষণে জানিলাম তাহা নহে; তোমরা আমার আত্মীয় তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেক দিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন সে বিষয়েত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি। শাস্ত্রে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটী বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি? যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এই পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব! আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই। বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া

উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।”

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন “তোমার দেশ উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।” ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কি দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন কিন্তু এ সময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সম্বরণ করিলেন। পরে নস্য শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, “বৎসে! আমি সকল দিগ ভাবিয়া দেখিলাম তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না অতএব স্থানান্তরে যাও।” এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন; দামিনী প্রথমে বুঝিতে পারি-

লেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিগ চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটি চিল বসিয়া আছে; খিড়কি পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বাররুদ্ধ করিয়াগিয়াছেন এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে, চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন স্বপ্ন নহে—সকলেই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেক গুলিন বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেইখানে নতমুখে বসিয়া একটি দুর্ব্বাদল, নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতে ছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভারতে এসেছিলে! আহা কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিত হরিণীর

ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল। আরে পোড়া বিধাতা! কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না! এই বয়সে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি মরি! মেয়েত নয়, যেন স্বর্ণ লতা!"

. আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী; বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।' 'আহা! যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল; শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে ফেলে আপনি চলে গেলে!" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শ্বাশুড়ী রাগভরে সশব্দে খিড়কির দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জান না কি যে এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না; সকলেই একে একে চলিয়া

গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন "একবার উঠত।" দামিনী বলিলেন, আমি আর কোথায়ও যাব না; কোথায়ও যাইবার আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না। সমবয়স্কা বলিল তবে কি এই খানে মরিবি? দামিনী উত্তর করিলেন "এইখানেই মরিব আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গেছেন আমি এইখানেই থাকিব। যতদিন তিনি না আসেন ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।"

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন অন্যত্র না যাও এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে আমরা আর দাড়াইতে পারিব না। দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড় মানুষ এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তরক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে বসিয়া অন্যমনস্কে একটি পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।

দা। তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?

প্র। সে কি! তাকি হইতে পারে?

দা। পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?

প্র। কি জানি ভাই। পুরুষের মন কখন কেমন থাকে তা কে বলিতে পারে?

দা। তিনি আমায় কত ভাল বাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমার কাছে আসিয়া বসেন। কত বার কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রি যাপন কিরূপে হইবে? কোথায় থাকিবে?" দামিনী প্রথমে বলিলেন "'কি জানি,'' পরক্ষণেই বলিলেন "এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন "তাকি স্ত্রীলোকের সাধ্য। এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। রাত্রের নিমিত্ত ঘরে না হউক বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শ্বাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু রাত্রি হইল প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। থিড়কি দ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেষে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুই একটী দীপালোক দেখা যাইতেছিল তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল, অন্ধকারে নানা দিকে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন, "মা!" স্বপ্নে যেন বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা!—এ ঘরে আর কাজ কি?"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন কোথাও দামিনীর সংবাদ পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ, আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা, বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকালপরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ নিঃসৃত একটি মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেইদিকে গেলেন। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন মৃত্যুশয্যায় একটী রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে

নিঃসৃত হইতে লাগিল। "আয়ি! এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "দামিনি, দামিনি! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

দামিনী কোন উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই; আর কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই; সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন সেখানে আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এজন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে;" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, "আমি চিনিয়াছি তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরা সকল উঠিল। রমেশ বাক্য রহিত, শক্তি রহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্ব মত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

পালামৌ।

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।)





পালামৌ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বহুকাল হইল একবার আমি পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন

পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সে স্থান কোন দিকে, কতদূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইন্‌লাণ্ড ট্রান্সিট কোম্পানীর (Inland Transit Company) ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসি তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের সঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা।" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নথ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালি।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল "না তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে, যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাঁধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড় পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল,

বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এই জন্য ফণাটী কিছু বড় করিতে হইয়াছে। *কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটী বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটী কালিয়দমনের কালিয়; কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালিয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়াই বাল্যকালেই পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি, সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে, যে পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ

কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাগাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপাদ বিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহ-প্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে

ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিপরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষি পত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারাণ্ডায় গুটি- কত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণকরিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের

তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেন না তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী! তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সঘৃত আতপান্ন, আর দেবীদুর্ল্লভ ছাগমাংস, এই দুইই নির্দ্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধরাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম

যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাক-শালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু!" এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালী পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন বোধ হয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাষ্টরমহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক সম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোকে যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে,অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা ; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে 'চালসা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবেরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালীরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন, যে কুঠীতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ; কুঠীটী যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায় তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন তিনি বলিতে পারেন যে যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা একথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই সেই মত শিখাইয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি তাঁহার মন "কুঠী"র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায়

যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে তাহা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য ?

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারি সাহেব "পেরেড" বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডের" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম্ পালামৌ প্রবল সহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশ্রান্তিসংবাহক ভাঁটভরা-

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর একঘরে দেখি এক কাঁদি সুপক্ক মর্ত্তমানরম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প। "কলাকাঁদির ফর্দ্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন একজন চাকর লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুইটি সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ "কাছারী" হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যেস্থান হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছিল ; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না ; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।' তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহার বাটীতেও পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার-গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটিতে স্থান দিয়া এক প্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

ওার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহরদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তার পর আরও দুই এক-ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারি দিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর,

পাহাড় আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহারগ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুকুর (Poodle) আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই

স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কনডক্টার (con- ductor) ; যে পর্য্যন্ত ননকনডক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয় সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্‌ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল

তমাল, হিন্তাল” শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শাল বন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকল গুলিই আমাদের দেশী কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠ ঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণ গোচর হইল, কাষ্ঠ ঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনু-সন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠ-ঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্পবিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখন দেখি নাই; সকলের গলায় পুতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকীর পরিবর্ত্তে এক

একখানি গোল আরসী ; পরিধানে ধড়া ; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে ; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে ; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন ব্রজগোপাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাতুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাতর পশুও পাতুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্ তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই ; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর ; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই ; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলের কটি-দেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান ; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে ; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা।

পাল্কীর ভিতরে কে বা কি তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি পল্লীগ্রামে বালক বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে "বরকনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্যবালক বালিকারাও অতি নিঠুর, অতি নির্দ্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্য বদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই এ কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্ব্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছা-

পূর্ব্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণ না হইলে তাহারা লোলচর্ম্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষ জাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্য মধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য্য কান্তি-বিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণায় পর্ব্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্য জাতির সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্য জাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহা-

দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্য্যগণের গোরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যেরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহুকাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে। অদ্য পর্য্যন্ত সেই পাহাড় পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বল বীর্য্য নাই; আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে বাস করে, আর কিছু দিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়া গিয়াছে অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পরাজিত জাতিরা বিজয়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্ব স্থানে যে সকল সুবিধা ছিল তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও এক সময় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই

অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপি তথায় সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে এমত শুনা যায় না।

মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেথানে সাহেবেরা গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, সেথানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডার, নিউ হলাণ্ডর, তাস্মানীয় প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরিনামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্,কর্ম্মঠ, বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল,বিশবৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি তাহা জানি না। বোধ হয় এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে, অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন "He is the noblest of savages, not equalled by the best of Red Indians." তথাপি এজাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে সাহেবদের অত্যাচারে? তাহা কদাচ নহে, ক্যানেডার অধিবাসীসম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিকি লিখিয়াছেন যে, "In Canada for the last fifty years the Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * * The Government has built them houses, furnished them with ploughs,

supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes, paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would." সমাজোপযোগী ভাল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের যাইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুললোপ হইল কেন ?

কেহ কেহ বলেন যে সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথার প্রত্যুত্তরে এক জন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা একথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারত-বর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ আর এক সময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে। কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয় তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক আগামী বারে সতর্ক হইব। কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল তাহা শেষ

হয় নাই। ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কথা কিছু বলি। কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালীর উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালী সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক ব্যাপার কি একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল!

তৃতীয় প্রবন্ধ।

পূর্ব্বে একবার "লাতেহার" নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয় তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ-পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত; তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমার পুরাতন কথা শুনিবে, তুমি শুন বা না শুন সে তোমার কথা শুনাবে, পুরাতন কথা এই রূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহার পুঁজি বাড়িবে না, কেন না আমার নিজের

পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পারিল না সে অভাগিনী সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটীকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়া-

ছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেই খানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষন্ন ভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটী শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম এই আমার "দুনিয়া।"

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার উপর দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটী কালো কালো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতে ছিলাম, এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদ মূলে তবায়ং।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারিদিক

চাহিলাম কোথাও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি এমত সময় আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্যুং ইত্যাদি।"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে, কতক কৌতূহলপরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না কিয়ৎ পরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল সুর আর ছন্দ শুনা গেল। "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটী পক্ষী আর একটীর নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তা-চ্ছন্দের একটিমাত্র শ্লোক জানিতাম; ছন্দটী উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্যুং।" কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই, কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক আমি অবাক হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যিনি "উদ্ধব দূত" লিখিয়াছেন, তিনি হয়ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন? শ্লোকটির সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং।
জাতং দৈবাদসদৃশমিদং বারমেকংক্ষমস্ব ॥

এতানাকর্ণয়সি নয়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদান্।
এভিঃ ক্রূরৈর্বয়মবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃ স্মঃ॥*

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময়ে কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে। দৈবাৎ যাহা গিয়াছে একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে কুঞ্জ পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল অর্থ না বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুনলে—কুঞ্জের ঐ পাখি কি বলিল—শুনলে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল "রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃপাদমূলে তবায়ং" তাহাই বলিতেছিলাম বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বাভাবিক আছে তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটীর সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটী রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্ব পুরুষের

অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিতেছে। বৈষ্ণবদের উচিত এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে একটী হরিয়াল পালন করি, দেখি সে "রাধে মন্ম্যং পরিহর" বলে কি না বলে।

আর একদিনের কথা বলি; তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যেরূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব!" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায় বুট, পরিধানে কোট পেন্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরণে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে চলিলাম। আমি স্বভাবতঃ

বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারীরা কত দিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণ-ক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে একথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে একথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে, সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায় সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভাল হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতকদূর গেলে সে আমায় বলিল, "বাঘটি আমি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল। তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল, যে পরহস্তে বাঘ মরা সম্ভব;

আমি সাহেববেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতকদূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে। আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতকদূর গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কুটির, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে" তদনুসারে আমি নত শিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল,

"আসুন, এই খানি ঠেলিয়া তুলি," উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানিনা ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। পর দিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটী আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি; কিন্তু ভাবিতেছি এবার কি লিখি? লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় ত আর ভাল লাগে না; পাহাড় জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে তাহারা জঙ্গলি, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই একথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবি ঢঙ্গে কুক্কুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় এক জন কে আসিয়া বাহির হইতে আমায় ডাকিল "খাঁ সাহেব!" আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ নং এক এই যে আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে। বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম হয় ত লোকটা আমাকে মুছলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "বোস মশায়" বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানি যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসি দেশে যাহার জুতা সেলাই হয় তাহাকে "বোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন? বাবু মহাশয় বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্" "বদ্জাত" প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার

বাহাদুরি। বোধ হয়, সে রাত্রে বড় শীত পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না; বোধ হয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে; তাহা কিছুই না করায়, আমি ভাবিলাম এব্যক্তি চমৎকার লোক। সেও হয় ত আমাকে ভাবিল "চমৎকার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে না, কি বলে ডাকিবে তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া 'খাঁ সাহেব' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ' বলিবা গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার "খানশামা বাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডূয়নশব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমার তখনও রাগ আছে, "খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত, এই জন্য কলিকা হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় "ফু" দিতে লাগিল, আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে, এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সেদিকে কিছুই নাই, কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; তাহার পরেই দেখি দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড

পাগড়ি, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটী রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল; গেঙ্গোখালি "মোহনায়" যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্ণে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম "জঙ্গলী পাখী হয় ত কখন মানুষ দেখে নাই, দেখিলে বিশ্বাসঘাতককে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমেষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম; তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক্ তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের

মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপ রাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের

এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাঁহারা বলেন যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি এমত সময় আমার খানসামা বাবু বলিল "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল।" শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পর দিবস অপরাহ্ণে দেখি এক বটতলায়, ছোট বড় কতকগুলা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই একটা "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম তাহারাও "বাই"; ব্যয় লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাইতেছে, এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল অতি প্রত্যূষে সে চলিয়া গিয়াছে, আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজপুত প্রতিবাসি বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল "খরচাও" ফুরাইয়াছে। দুইদিন উপবাস করেছে, আরও কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ কতক

অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকা ডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হইত না; অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এইরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি দশক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে; এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা "দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্য লোকেরা এক এক স্থানে "পাতকোয়ার" আকারে ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—

তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাদে জল ক্রমে চুঁইয়া জমে। আট দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদ গুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন? আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃণ্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশজনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল ; সকলেরই অনাবৃত দেহ ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক এক-বার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন ; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না ; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত

কণ্ঠে একটি গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা, অনেকের নিকট রহস্যের কথা কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপ বাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতী তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটী একটী ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে দুই তিন স্থানে হুহু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক বার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত; অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

কোলের নৃত্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্‌কি লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না; ভাবিলাম না করুক, আমি স্ববাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্ণে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি পাল্‌কিতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতকদূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না; হয় ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম, আর রাগভরে পাতুরে মেয়েগুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর

পাল বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর ঐকবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগানে "লসিংটন লজ" হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক টক শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি গবর্ণর জেনেরল কাউন্সলের অমুক মেম্বারের কুল কন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয় ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেই জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন, যেন সেই সঙ্গে একটু "দুয়ো" দিয়া গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে তাহা-দের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে;—কলা গাছে ঝড়, আর সীমুল গাছে সমীরণ?

• সে সকল রাগের কথা এখন যাক, যে হারে সেই রাগে।

কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে এক-রূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাও কি, কি তাহা স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রি যাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয় ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্তও দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতিরাত্রে কুমার কুমারীর বাক্‌চাতুরী হইতে থাকে, শেষে তাহাদের মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটী ঠিক নহে। কোলেরা প্রেম প্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক্। নৃত্য, হাস্য উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া

উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয় বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে সান দেয়। আর অনবরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী হাসি হাসি মুখে বেশ বিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়, হয় ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশ বিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথায় গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটী ডাল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা, সখা সুবলের মত লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে করিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল। হাত পাও আছড়াইল। এবং চড়টা চাপড়টাও যুবাকে মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না! কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা "মার মার" রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহারা বাহির হইয়া পথরোধ করিল। শেষ

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশ মুখী। কিন্তু শুনিয়াছি দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী আচারের সময়ে বরের পৃষ্ঠে বাউটি-বেষ্টিত নানা গুজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসি পিসি একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয় তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অন্তর্গত। *

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন পনর টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম তাহা Exogamy নহে। কেন না ইহা স্বজাতি বিবাহ।

অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ্জ করিল সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাদকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে; মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে আশল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাদক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাদক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাদক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিলে সে রীতিমত

গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম বিনা বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন আমি বড় লোক, আমি "ধূমধাম" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায় "আমি ধনবান্" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয় হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের

সর্ব্বস্ব নয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

"কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণ দানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভালথাকীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পর দিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি এক বার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্ব রাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্ব্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে অদ্য আবার এ কেন মা? নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয় ত বলিত এই কুক্কুরী সংসারী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল তখন দেখিল মাতার সম্মুখে কতকগুলি

লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হ'লে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল "না মা! আমি বলি বুঝি কার জন্যে রেখেছ?" নববধূ হয় ত মনে করিল পূর্ব্বে আমায় "ওই" বলিতে, আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য! একরাতের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য্য। নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল, যে মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরোধে ও আগ্রহে বহুদিন পরে বঙ্কিম বাবুর গীতা মুদ্রিত হইল। বঙ্কিম বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য মূল্য ২৲ টাকা মাত্র ধার্য্য করা গেল। এই পুস্তক বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় সকল দোকানেই পাওয়া যায়।

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ নং প্রতাপচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

বিশেষ নিয়ম।

কোন বিক্রেতা এক বৎসর মধ্যে এক-হাজার টাকার বহি বিক্রয় করিলে, তাঁহাকে ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়। অর্থাৎ ৭৫০৲ টাকা রাখিয়া ২৫০৲ টাকা তাঁহাকে দেওয়া যায়। ১লা জানুয়ারি হইতে ১লা জানুয়ারি বা ১লা বৈশাখ হইতে ১লা বৈশাখ হিসাব হয়।

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ নং প্রতাপচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

পুস্তকের তালিকা।

দুর্গেশনন্দিনী	...	...	২৲
কপালকুণ্ডলা	...	...	১।০
মৃণালিনী	...	...	১৸০
বিষবৃক্ষ	...	...	১॥০
চন্দ্রশেখর	...	...	১॥০
রজনী	...	...	১৵০
কৃষ্ণকান্তের উইল	...	...	১॥০
রাজসিংহ	...	...	২৸০
আনন্দমঠ	...	...	১॥০
দেবী চৌধুরাণী	...	...	২৲
সীতারাম	...	...	২৲
ইন্দিরা	...	...	১॥০
যুগলাঙ্গুরীয়	...	...	।০
রাধারাণী	...	...	।৵০
যুগলাঙ্গুরীয় ইংরাজি অনুবাদ ভাল কাগজে উত্তম ছাপা	...	...	॥০
কমলাকান্তের দপ্তর	...	...	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	...	...	২৲

কৃষ্ণচরিত্র	... ...	৩৲
ধর্ম্মতত্ত্ব	... ...	২৲
লোক রহস্য	... ...	
গদ্যপদ্য	... ...	৸৶
বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ	...	১৷৹
বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ	...	২৲
সঞ্জীবনী সুধা	... ...	৸৹
সহজ ইংরাজি শিক্ষা—সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিলেই ইহা হইতে বিনা সাহায্যে ইংরাজি শেখা যায়	...	৶৹
সহজ রচনা শিক্ষা—ইহা টেক্ষ্ট্‌বুক কমিটি হইতে যথারীতি পাস হইয়াছে। বালকদিগের রচনা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকারে আসিবে। মূল্য	...	৵৹
সংগ্রহ-মঞ্জরী—বঙ্কিমবাবুর পুস্তকাবলী হইতে হইতে সঙ্কলিত—ইহা টেক্ষ্ট্‌-বুক-কমিটি স্কুলপাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। মূল্য	...	৷৹

নিম্নলিখিত স্থানে ঐ সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্তবাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

মেঃ এ, কে, রায় ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট।

মেঃ বি, বাঁড়ুর্য্যে কোম্পানি
২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

এবং অন্যান্য সকল দোকানে পাওয়া যায়।

প্রকাশক
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫ নং প্রতাপচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

